আল হাদীদ

৫৭

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্ব সম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐ সব লোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের

মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মোবাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ–সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ–সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ–সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোন অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের মোকাবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু'টি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ ব্যয় করবে ইসলামের বিজয় যুগে তার বিস্তার ও প্রসারের জন্য যারা প্রাণ ও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ–সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে। এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোন পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে

তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়মন বিগলিত হয় না। এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায় সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষে ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম–আয়েশ ও বিপদ আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম–আয়েশ ও সুখ–শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে ওঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তার পর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে।

এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাতে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এই সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣

যমীন ও আসমানসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর তাসবীহ করেছে।[১] তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।[২] পৃথিবী ও আকাশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিক তিনিই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই আদি তিনি অন্ত এবং তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপন।[৩] তিনি সব বিষয়ে অবহিত।

১. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তার ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। এখানে অতীতকাল নির্দেশক শব্দরূপ سَبَّحَ ব্যবহার করা হয়েছে এবং অন্য কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল নির্দেশক শব্দ يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণু চিরদিন তার স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে, আজও করছে এবং ভবিষ্যতেও চিরদিন করতে থাকবে।

২. মূল আয়াতে هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যের শুরুতেই هو শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ শুধু তাই নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র তিনিই এমন সত্তা যিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ। عَزِيْزٌ শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী যার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, যার সাথে টক্কর নেয়ার সাধ্য কারো নেই, ইস্থায় বা অনিচ্ছায় যার আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যার অমান্যকারী কোনভাবেই তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حَكِيْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যাই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে

করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝতে হবে। কুরআন মজীদের অতি অল্প সংখ্যক স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম عزيز (মহাপরাক্রমশালী) এর সাথে قوى (নিরংকুশ শক্তির অধিকারী), مقتدر (ক্ষমতাধর), جبار (আপন নির্দেশাবলী বাস্তবায়নকারী) এবং ذوانتقام (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যার সাহায্যে তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা জালেম ও অবাধ্যদের জন্য আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন দাবী করে কেবল সেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের হাতে গোনা কতিপয় স্থান বাদ দিলে আর যেখানেই عزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই তার সাথে সাথে حكيم (অতিশয় বিজ্ঞ), عليم (সর্বজ্ঞাতা), رحيم (দয়াল, নিয়ামতদানকারী), غفور (ক্ষমাশীল) وهاب (সার্বক্ষণিক দানকারী) এবং حميد (প্রশংসিত) শব্দগুলোর মধ্য থেকে কোন শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সে যদি নির্বোধ হয়, মূর্খ হয়, দয়া মায়াহীন হয়, ক্ষমা ও মার্জনা আদৌ না জানে, কৃপণ হয় এবং দুশ্চরিত্র হয় তাহলে তার ক্ষমতার পরিণাম জুলুম নির্যাতন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীতে যেখানেই জুলুম নির্যাতন হচ্ছে তার মুল কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে সে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে হয় মূর্খতার সাথে ব্যবহার করছে, নয়তো সে দয়ামায়াহীন, কঠোর হৃদয় অথবা কৃপণ ও সংকীর্ণমনা কিংবা দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মশীল। যে ক্ষেত্রেই শক্তির সাথে এসব দোষ একত্রিত হবে সে ক্ষেত্রেই কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। এ কারণে কুরআন মজীদে আল্লাহর গুনবাচক নাম عزيز এর সাথে তাঁর حكيم ، عليم ، رحيم ، غفور ، حميد ও وهاب হওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মানুষ জানতে পারে, যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহান শাসন ও পরিচালনা করছেন একদিকে তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না, অপর দিকে তিনি حكيم বা (মহাজ্ঞানী)ও বটে। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সরাসরি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তিনি عليمও। যে ফায়সালাই তিনি করেন জ্ঞান অনুসারেই করেন। তিনি رحيمও। নিজের অসীম ক্ষমতা ও কতৃত্বকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি غفورও। অধীনস্তদের সাথে ছিদ্রান্বেষণ বা খুঁত ধরা মানসিকতার নয়, বরং ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন। তিনি وهابও। নিজের অধীনস্তদের সাথে কৃপণতার আচরণ করেন না। বরং চরম দানশীলতা ও বদান্যতার আচরণ করছেন। এবং তিনি حميد ও। তাঁর সত্তায় প্রশংসার যোগ্য সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণতার সমাহার ঘটেছে।

যারা সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) ওপর রাষ্ট্র দর্শন ও আইন দর্শনের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত, তারা কুরআনের এ বক্তব্যের প্রকৃত গুরুত্বকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন। সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক হবে। তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী, তা পরিবর্তনকারী বা পুনর্বিবেচনাকারী কোন আভ্যন্তরীণ বা বাইরের শক্তি থাকবে না এবং তার আনুগত্য করা ছাড়া কারো কোন উপায়ও থাকবে না। এ অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের

ধারণার সাথে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনিবার্যরূপেই দাবী করে যে, যিনি এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন তাকে নিষ্কলুষ এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। কারণ, এরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোক নির্বোধ, মুর্খ, দয়ামায়াহীন এবং দুশ্চরিত্র হলে তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সর্বাত্মক জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ কারণে যেসব দার্শনিক কোন মানুষ বা মানবীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন একদল মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছে তাদেরকে একথাও ধরে নিতে হয়েছে যে, তারা ভুল ক্রটির উর্ধে হবে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, কোন মানবীয় কর্তৃত্ব বাস্তবে যেমন কখনো এরূপ নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারে না তেমনি কোন বাদশাহ বা পার্লামেন্ট, জাতি কিংবা পার্টি সীমিত পরিসরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে থাকে তা নির্ভুল পন্থায় কাজে লাগানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এমন যুক্তিবুদ্ধি যার মধ্যে অজ্ঞতার লেশমাত্র নেই এবং এমন জ্ঞান যা সংশ্লিষ্ট সব সত্যকে পরিব্যাপ্ত করে—কোন একজন মানুষ, একক কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন জাতির ভাগ্যে জুটে যাওয়া তো দূরের কথা, সম্মিলিতভাবে গোটা মানব জাতিও লাভ করেনি। অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ মানুষ ততক্ষণ তার পক্ষে নিজের স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভয়ভীতি, লোভ লালসা, ইচ্ছা আকাংখা, পক্ষপাতিত্ব, আবেগ তাড়িত সন্তুষ্টি ও ক্রোধ এবং ভালবাসা ও ঘৃণা করা থেকে উর্ধে উঠাও সম্ভবপর নয়। এসব সত্যকে সামনে রেখে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, এ বক্তব্যের মধ্যে কুরআন প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের সঠিক ও পূর্ণাংগ ধারণা পেশ করছে। কুরআন বলছে ঃ عزيز এ বিশ্ব-জাহানে অর্থাৎ নিরংকুশ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নেই। আর কেবল তিনিই সমাহীন এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা যিনি 'নিষ্কলুষ' 'হাকীম' ও 'আলীম' 'রাহীম' ও 'গাফুর' এবং 'হামীদ' ও 'ওয়াহহাব'।

৩. অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন। তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যে জিনিসের প্রকাশ দেখা যায় তা তাঁরই গুণাবলী, তাঁরই কার্যাবলী এবং তাঁরই নূরের প্রকাশ। আর তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাঁর সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তাঁর রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না। ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এবং হাফেজ আবু ইয়া'লা মুসেলী তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া সম্বলিত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নিম্নোক্ত কথাগুলোই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ঃ

انت الاول فليس قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ وانت
ال ظاهر فليس فوقك شيئ وانت الباطن فليس دونك شيئ -

"তুমিই সর্ব প্রথম। তোমার পূর্বে আর কেউ নেই। তুমিই সর্বশেষ। তোমার পরে আর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য। তোমার চেয়ে প্রকাশ্য কেউ নেই। তুমি গুপ্ত। তোমার চেয়ে অধিক গুপ্ত আর কেউ নেই।"

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ﴿۴﴾ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۵﴾ یُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ ؕ وَهُوَ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۶﴾

তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৪] যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে যায়[৫] তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন।[৬] তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন। আসমান ও যমীনের নিরংকুশ ও সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁরই। সব ব্যাপারের ফায়সালার জন্য তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হয়। তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মজীদে জান্নাত ও দোযখবাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলাই সর্বশেষ অর্থাৎ যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন—তার সাথে এ কথা কি করে খাপ খায়? এর জবাব কুরআন মজীদের মধ্যেই বিদ্যমান। (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ (القصص : ٨٨ অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর সব জিনিসই নশ্বর ও ধ্বংসশীল।" অন্য কথায় কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয়ে আছে এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে আর সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। কেউ আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্টে অবিনশ্বর বিধায় জান্নাত বা দোযখে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে—এমনটা নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্টে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকতে পারে।

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের[৭] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ব্যয় কর[৮] সে জিনিস যার প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা তিনি তোমাদের দিয়েছেন।[৯] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও অর্থ-সম্পদ খরচ করবে[১০] তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনছো না। অথচ তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য রসূল তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন[১১] অথচ তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।[১২] যদি তোমরা সত্যিই স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হও।

৪. অর্থাৎ বিশ্বজাহানের স্রষ্টাও তিনি শাসনকর্তাও তিনি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪১-৪২, ইউনুস, টীকা ৪, আর রা'দ, টীকা ২ থেকে ৫, হামীম আস সাজদা, টীকা ১১ থেকে ১৫)।

৫. অন্য কথায় তিনি শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খালবিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। কোন্ দানাটি ও বীজটি পৃথিবীর কোন্খানে কিভাবে পড়ে আছে তা তিনি জানেন বলেই সেটিকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরোদগম করেন এবং তাকে লালন পালন করে বড় করেন। কি পরিমাণ বাষ্প কোন্ কোন্ স্থান থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় পৌছেছে তা তিনি জানেন বলেই সেগুলো একত্রিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের জন্য তা বন্টন করে দিয়ে একটি হিসেব অনুসারে বৃষ্টিপাত ঘটান। আর যেসব জিনিস মাটিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যেসব জিনিস আসমানের দিকে উঠে যায় ও তা থেকে নেমে আসে তার বিস্তারিত দিকও এর আলোকে অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আল্লাহর জ্ঞান যদি এসব বিষয়ে পরিব্যপ্ত না হতো, তাহলে প্রতিটি জিনিসই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যেকটি জিনিসই এমন নিপুন, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় ব্যবস্থাপনা করা কিভাবে সম্ভব হতো?

৬. অর্থাৎ তোমরা কোন জায়গায়ই তাঁর জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার আওতা বহির্ভূত নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা কোন

নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ঐ স্থানেও তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ডে যে স্পন্দন উঠছে, তোমাদের ফুসফুস যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছে, তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যে কাজ করছে এসব কিছুরই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় তোমাদের দেহের সব যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে। কোন সময় যদি তোমাদের মৃত্যু আসে তাহলে এ কারণে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৭. অমুসলিমদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি। বরং পরবর্তী গোটা বক্তব্য থেকে একথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে সেই সব মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ইসলামের বাণী স্বীকার করে ঈমান গ্রহণকারীদের সাথে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং মু'মিনের মত জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা সবারই জানা যে, অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই একথা বলা যায় না যে, আল্লাহর পথে জিহাদের খাতে উদার মনে সাহায্য করো। কিংবা তাদেরকে একথাও বলা যায় না যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়লাভের পূর্বে জিহাদ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে তাদের মর্যাদা যারা বিজয়লাভের পরে এসব কাজ করবে তাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের প্রাথমিক দাবী পেশ করা হয়ে থাকে, চূড়ান্ত দাবী নয়। এ কারণে বক্তব্যের ধারা অনুসারে এখানে اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ বলার অর্থ হচ্ছে, হে সেই সব লোক, যারা ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছো—আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সরল মনে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করো যা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের করা উচিত।

৮. এখানে ব্যয় করার অর্থ সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা নয়। বরং ১০ নম্বর আয়াতের ভাষা স্পষ্টভাবে বলছে যে, এখানে এর অর্থ ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে সমুন্নত করার যে সংগ্রাম চলছিলো সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। বিশেষ করে সে সময় এমন দু'টি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যে জন্য ইসলামী সরকার চরমভাবে আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। এর একটি ছিল সামরিক প্রয়োজন। আর অপরটি ছিল সেসব নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করা যারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আরবের প্রতিটি অংশ থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলো এবং আরো আসছিলো। এ ব্যয় মেটানোর জন্য সত্যিকার মু'মিনগণ তাঁদের শক্তি ও সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা নিজেরা বহন করছিলো। পরবর্তী ১০, ১২, ১৮ ও ১৯ আয়াতে এজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহসংখ্যক এমন স্বচ্ছল লোকও ছিল যারা কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতকে নিছক দর্শক হয়ে দেখছিলো। যে জিনিসের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী তারা করছিলো তার কিছু কর্তব্য ও দায়–দায়িত্ব যে, তাদের প্রাণ ও সম্পদের ওপর বর্তায়, সে বিষয়ে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। এ দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকেই এ আয়াতে

সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর।

৯. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তা মূলত তোমাদের নিজের সম্পদ নয়, তা আল্লাহর দেয়া সম্পদ। তোমরা নিজেরা এর মালিক নও। আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমদের অধিকারে দিয়েছেন। অতএব, সম্পদের মূল মালিকের কাজে তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ও পিছপা হয়ো না। মালিকের সম্পদ মালিকের কাজে ব্যয় করতে টালবাহানা করা প্রতিনিধির কাজ নয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ অর্থ চিরদিন তোমাদের কাছে ছিল না এবং চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবেও না। কাল তা অন্য কিছু লোকের কাছে ছিল, আজ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে তা তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আবার এমন এক সময় আসবে যখন তা তোমাদের কাছে থাকবে না। অন্য লোকেরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সাময়িক কৃর্তত্বের এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন এ সম্পদ তোমাদের অধিকার ও কর্তৃত্বে থাকে তখন আল্লাহর কাজে তা খরচ করো, যাতে আখেরাতে তোমরা তার স্থায়ী প্রতিদান লাভ করতে পার। একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ঃ একবার নবীর (সা) বাড়ীতে একটি বকরী জবাই করে তার গোশত বন্টন করা হলো। ঘরে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বকরীর কি অবশিষ্ট আছে ? হযরত আয়েশা বললেন ঃ مَا بَقِىَ اِلاَّ كَتِفُهَا "একটি হাত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।" নবী (সা) বললেন ঃ بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا "একটি হাত ছাড়া গোটা বকরীই অবশিষ্ট আছে।" অর্থাৎ আল্লাহর পথে যা ব্যয়িত হলো প্রকৃতপক্ষে সেটাই অবশিষ্ট রইলো। আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল কোন্ প্রকার দানের সওয়াব সবচেয়ে বেশী? তিনি বললেন ঃ

ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان -

"যদি তুমি এমন পরিস্থিতিতে দান করো যে, তুমি সুস্থ সবল সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করছো এবং তা কোন কাজে খাটিয়ে অধিক উপার্জনের আশা করো। সে সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর তুমি ওসিয়ত করবে যে, এটা অমুককে দিতে হবে এবং এটা অমুককে দিতে হবে। সে সময় তো এ সম্পদ অমুক অমুকের কাছেই চলে যাবে" (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা) বলেছেন ঃ

يقول ابن ادم مالى مالى ، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت ، او تصدقت فامضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس -

"মানুষ বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদের যতটা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করলে কিংবা পরিধান করে পুরনো করে ফেললে অথবা দান করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করলে তা ছাড়া তোমার সম্পদে তোমার আর কোন অংশ নেই। এছাড়া আর যাই আছে একদিন তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে আর তুমি অন্যদের জন্য তা রেখে যাবে"। –(মুসলিম)

১০. এখানে পুনরায় জিহাদে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ঈমানের আবশ্যিক প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য কথায় যেন বলা হয়েছে। প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মু'মিন সে–ই, যে এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থ ব্যয় করতে টালবাহানা করে না।

১১. অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতিতে তোমরা ঈমানের পরিপন্থী এই কর্মপন্থা গ্রহণ করছো যখন আল্লাহর রসূল নিজে তোমাদের মাঝে আছেন এবং তোমাদেরকে কোন দূরবর্তী মাধ্যমের সাহায্যে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে না, বরং তোমাদের কাছে সে দাওয়াত সরাসরি আল্লাহর রসূলের মুখ থেকে পৌছুচ্ছে।

১২. কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক–বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান। কিন্তু সঠিক কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ (المائده :٧)

"আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ মনের কথাও জানেন।"

হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

بايعنا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم على السمع والطاعة فى النشاط والكسل وعلى النفقة فى العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى ان نقول فى اللّٰه تعالى ولا نخاف لومة لائم - (مسند احمد)

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٩ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۗ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٠

সেই মহান সত্তা তো তিনিই যিনি তাঁর বান্দার কাছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করছেন যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়ালু ও মেহেরবান। কি ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ যমীন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই।[১৩] তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব লোকের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১৪] তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[১৫]

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।" (মুসনাদে আহমদ)।

১৩. এর দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এ অর্থ সম্পদ চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবে না। একদিন তা ছেড়ে তোমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে এবং তখন আল্লাহই হবেন এর উত্তরাধিকারী। তাহলে নিজের জীবদ্দশায় নিজের হাতে কেন তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? এভাবে ব্যয় করলে আল্লাহর কাছে তোমাদের পুরস্কার প্রাপ্য হবে। ব্যয় না করলেও তা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তবে পার্থক্য হবে এই যে, সে ক্ষেত্রে তোমরা কোন পুরস্কার লাভ করবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে

আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি পৃথিবী ও উর্ধ জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তাঁর কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। একথাটাই অন্য একটা স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۖ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - (السبا : ٣٩)

"হে নবী, তাদের বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ করো তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরো রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।" (সাবা–৩৯)

১৪. অর্থাৎ উভয়েই পুরস্কার লাভের যোগ্য। কিন্তু এক গোষ্ঠীর মর্যাদা অপর গোষ্ঠীর চেয়ে নিশ্চিতভাবেই অনেক উচ্চতর। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। তারা এমন পরিস্থিতিতে অর্থ খরচ করেছে যখন কোথাও এ সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না যে, বিজয়ের মাধ্যমে এ ব্যায়ের ক্ষতিপূরণ হবে। তাছাড়া তারা এমন নাজুক সময়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যখন প্রতি মুহূর্তে এ আশংকা ছিল যে, শত্রু বিজয় লাভ করে ইসলামের অনুসারীদের পিষে মারবে। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন ঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেন ঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটির সমর্থনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করা হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বললেন ঃ অচিরেই এমন লোক জন আসবে যাদের আমল বা কাজকর্ম দেখে তোমরা নিজেদের কাজকর্মকে নগণ্য মনে করবে। কিন্তু

لو كان لاحدهم جبل من ذهب فانفقه ما ادرك مد احدكم ولا نصيفه -

"তাদের কারো কাছে যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে আর সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও সে তোমাদের দুই রতল এমন কি এক রতল পরিমাণ ব্যয় করার সমকক্ষও হতে পারবে না" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআইম ইসফাহানী)।

তাছাড়া ইমাম আহমদ কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ একবার হযরত খালেদ (রা) ইবনে ওয়ালীদ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনে আওফের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার মুহূর্তে হযরত

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ۚ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

২ রুকূ’

এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে? উত্তম ঋণ যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সেদিন তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান[১৬] যেদিন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে, তাদের ‘নূর’ তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে।[১৭] (তাদেরকে বলা হবে) "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ।" জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা। সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এই যে, তারা মু’মিনদের বলবে ঃ আমাদের প্রতি একটু লক্ষ কর যাতে তোমাদের ‘নূর’ থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি।[১৮] কিন্তু তাদের বলা হবে ঃ পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের নূর তালাশ কর। অতপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতর দিকে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।[১৯]

খালেদ (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) কে বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের অতীত কাজ কর্মের কারণেই আমাদের কাছে গর্ব কর এবং বড় হতে চাও।" এ কথা নবীর (সা) কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ ! যদি তোমরা উহুদের সমপরিমাণ বা পাহাড়গুলোর সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করো তবুও এসব লোকের আমলের সমান হতে পারবে না।" এ থেকে প্রমাণ পেশ করা হয় যে, বিজয় অর্থ হুদাইবিয়ার

সন্ধি। কারণ, হযরত খালেদ হুদাইবিয়ার এ সন্ধির পরে ঈমান এনেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিশেষ ক্ষেত্রে বিজয় বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধি কিংবা মক্কা বিজয় যা–ই বুঝানো হোক না কেন সর্বক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, এ একটি মাত্র বিজয় মর্যাদার পার্থক্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বরং এ থেকে নীতিগত যে কথাটি জানা যায় তা হচ্ছে, ইসলামের জন্য যখনই এমন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন কুফর ও কাফেরদের পাল্লা অনেক ভারী হবে এবং বাহ্যত ইসলামের বিজয় লাভ করার কোন সুদূর সম্ভাবনা দৃষ্টি গোচর হবে না সে সময় যারা ইসলামের সহযোগিতায় জীবনপাত ও অর্থ–সম্পদ খরচ করবে তাদের সমমর্যদা সেসব লোক লাভ করবে না যারা কুফর ও ইসলামের মধ্যকার ফায়সালা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করবে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে যে প্রতিদান দেন ও মর্যাদা দান করেন তা এই দেখে দান করেন যে, সে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ ধরনের আবেগ অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছে। তিনি অন্ধভাবে বন্টন করেন না। তিনি জেনে শুনেই প্রত্যেককে মর্যাদা ও তার কাজের প্রতিদান নির্ধারণ করে থাকেন।

১৬. এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নামধামের আকাংখা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় এবং নবীর (সা) পবিত্র মুখ থেকে লোকজন তা শুনতে পায় তখন হযরত আবুদ দাহ্দাহ আনসারী জিজেস করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান? জবাবে নবী (সা) বলেন ঃ হে আবুদ দাহ্দাহ, হাঁ।' তখন তিনি বললেন ঃ আপনার হাত আমাকে একটু দেখান। নবী (সা) তার দিকে নিজে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবুদ দাহ্দাহ নবীর (সা) হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ "আমি আমার রবকে আমার বাগান ঋণ দিলাম" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সেই বাগানে ৬ শত খেজুর গাছ ছিল। বাগানের মধ্যেই ছিল আবুদ দাহ্দাহের বাড়ী। তার ছেলে মেয়েরা সেখানেই থাকতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এসব কথাবার্তা বলে তিনি সোজা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ "দাহ্দাহর মা, বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার রবকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিয়েছি।" স্ত্রী বললো ঃ দাহ্দাহর বাপ, তুমি অতিশয় লাভজনক কারবার করেছো" এবং সেই মুহূর্তেই সব আসবাবপত্র ও ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন" (ইবনে আবী হাতেম)। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় সে সময় প্রকৃত মু'মিনদের কর্ম পদ্ধতি কেমন ছিল। এ থেকে একথাও বুঝা যায়, যে কর্জে হাসানাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে

ফেরত দেয়ার এবং তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কেমন।

১৭. এ আয়াতটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই 'নূর' থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে। যেখানে আলো যেটুকু হবে তা হবে সৎ আকীদা–বিশ্বাস ও সৎ আমলের। ঈমানের সততা এবং চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতাই 'নূরে' রূপান্তরিত হবে যার কারণে সৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব ঝলমলিয়ে উঠবে। যার কর্ম যতটা উজ্জল হবে তার ব্যক্তি–সত্তার আলোক রশ্মিও তত বেশী তীব্র হবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবে তখন তার 'নূর' বা আলো তার আগে আগে ছুটতে থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে কাতাদা বর্ণিত একটি 'মুরসাল' হাদীস। উক্ত হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কারো কারো 'নূর' এত তীব্র হবে যে, মদীনা থেকে "আদন" এর সম পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত পৌছতে থাকবে। তাছাড়া কারো 'নূর' পৌছবে মদীনা থেকে সান'আ পর্যন্ত, কারো তার চেয়েও কম এমনকি এমন মু'মিন থাকবে যার নূর তার পায়ের তলা থেকে সামনে যাবে না" (ইবনে জারীর)। অন্য কথায় যার মাধ্যমে পৃথিবীর যত বেশী কল্যাণ হবে তার 'নূর' তত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে তার কল্যাণ পৌছবে হাশরের ময়দানেও তার নূরের আলো ততটা দূরত্ব পর্যন্ত দৌড়াতে থাকবে।

এখানে একটি প্রশ্ন মানুষের মনে দ্বিধা–দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, নূর বা আলোক রশ্মির আগে আগে দৌড়ানোর ব্যাপারটি বোধগম্য হয়। কিন্তু শুধু ডান পাশে নূর দৌড়ানোর অর্থ কি? তবে কি তাদের বাঁ দিকে অন্ধকার থাকবে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, কেউ যদি তার ডান হাতে আলো নিয়ে পথ চলতে থাকে তাহলে তার বাঁ দিকটাও কিন্তু আলোকিত হবে। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, আলো আছে তার ডান হাতে। হযরত আবু যার ও আবুদ দারদা কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস থেকে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্য পাওয়া যায়। নবী (সা) বলেছেন ঃ

اعرفهم بنورهم الذى يسعى بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم–

"আমি সেখানে আমার উম্মতের নেক্‌কার লোকদের তাদের নূরের সাহায্যে চিনতে পারবো—যে নূর তাদের সামনে ডানে ও বাঁয়ে দৌড়াতে থাকবে" (হাকেম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)।

১৮. অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যখন জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখন আলো থাকবে তাদের সামনে আর মুনাফিকরা পেছনের অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। সে সময় তারা ঈমানদারদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে। আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও যাতে আমরাও কিছু আলো পেতে পারি। কারণ এ মুনাফিকরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের সাথে একই মুসলিম সমাজে বসবাস করতো।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

তারা ঈমানদারদের ডেকে ডেকে বলবে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?[২০] ঈমানদাররা জওয়াব দেবে হাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে[২১], সুযোগের সন্ধানে ছিলে,[২২] সন্দেহে নিপতিত ছিলে[২৩] এবং মিথ্যা আশা-আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালা এসে হাজির হলো[২৪] এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বড় প্রতারক[২৫] আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা করে চললো। অতএব, তোমাদের নিকট থেকে আজ কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের নিকট থেকেও গ্রহণ করা হবে না যারা সুস্পষ্টভাবে কুফরিতে লিপ্ত ছিল।[২৬] তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে (জাহান্নাম) তোমাদের খোঁজ খবর নেবে।[২৭] এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।

১৯. এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতবাসীগণ ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। দরজার এক দিকে থাকবে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আর অপরদিকে থাকবে দোযখের আযাব। যে সীমারেখা জান্নাত ও দোযখের মাঝে আড়াল হয়ে থাকবে মুনাফিকদের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

২০. অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের সাথে একই মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত ছিলাম না? আমরা কি কালেমায় বিশ্বাসী ছিলাম না? তোমাদের মত আমরাও কি নামায পড়তাম না? রোযা রাখতাম না? হজ্জ ও যাকাত আদায় করতাম না? আমরা তোমাদের মজলিসে শরীক হতাম না? তোমাদের সাথে কি আমাদের বিয়ে শাদী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না? তাহলে আমাদের ও তোমাদের মাঝে আজ এ বিচ্ছিন্নতা আসলো কিভাবে?

২১. অর্থাৎ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা খাঁটি মুসলমান হও নাই, বরং ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান ছিলে, কুফরী ও কাফেরদের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ কখনো ছিন্ন হয়নি এবং তোমরা নিজেদেরকে কখনো ইসলামের সাথে পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করনি।

২২. আয়াতে মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে تَرَبَّصْتُمْ । আরবী ভাষায় تَرَبُّص বলে অপেক্ষা করা ও সুযোগলাভের প্রতীক্ষায় থাকাকে। কেউ যখন দু'টি পথের কোন একটিতে চলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বরং এই ভেবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, যেদিকে যাওয়া লাভজনক বলে মনে হবে সেদিকেই যাবে তখন বলা হয় সে تَرَبُّص এ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহা সত্যের সামনে অবনত হবে[২৮] এবং তারা সেসব লোকদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের মন কঠোর হয়ে গিয়েছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে আছে।[২৯] খুব ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে মৃত হয়ে যাওয়ার পর জীবন দান করেন। আমরা তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দশনসমূহ দেখিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও।[৩০]

পড়ে আছে। কুফর ও ইসলামের মধ্যকার সে নাজুক যুগে মুনাফিকরা এ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। তারা খোলাখুলি কুফরের পক্ষও অবলম্বন করছিল না। আবার পূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির সাথে নিজের শক্তিকে ইসলামের সাহায্য সহযোগিতায় কাজে লাগাচ্ছিলো না। বরং যথারীতি বসে বসে দেখছিলো, এ শক্তি পরীক্ষায় কোন্ দিকের পাল্লা শেষ পর্যন্ত ভারী হয়। যাতে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে বলে মনে হলে সে ইসলামের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়তে পারে এবং মুসলমানদের সাথে কালেমায় বিশ্বাস করার যে সম্পর্ক আছে তা কাজে লাগে। আর যদি কুফরী শক্তি বিজয়ী হয় তাহলে তার সহযোগীদের সাথে যেয়ে শামিল হতে পারে এবং তখন ইসলামের পক্ষ থেকে যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করা তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

২৩. এর অর্থ বিভিন্ন রকম সংশয়--সন্দেহ। মুনাফিকরা এ ধরনের সংশয়-সন্দেহে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলোই মুনাফিকীর মূল কারণ। সে আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। রসূলের রিসালাতে সন্দেহ পোষণ করে, কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তাতেও সন্দেহ পোষণ করে। আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করে এবং তার মনে এরূপ সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্বের সত্যিই কি কোন স্বার্থকতা আছে? না কি এসবই একটা ঢং। সত্য

শুধু এত টুকুই যে, সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকো। এটাই সত্যিকারের জীবন। যতক্ষণ না কেউ এ ধরনের সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হবে ততক্ষণ সে মুনাফিক হতে পারে না।

২৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মৃত্যু এসে গেল এবং তোমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতারণার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারনি। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইসলাম বিজয় লাভ করলো আর তোমরা তামাশার মধ্যেই ডুবে রইলে।

২৫. অর্থাৎ শয়তান।

২৬. এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে কাফেরের পরিণতি যা হবে মুনাফিকের পরিণতিও ঠিক তাই হবে।

২৭. মূল আয়াতে ব্যবহৃত কথাটি হচ্ছে هِىَ مَوْلَاكُمْ "দোযখই তোমাদের مولى । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সেটিই তোমাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তো আল্লাহকে তোমাদের অভিভাবক বানাওনি যে, তিনি তোমাদের তত্বাবধান করবেন। এখন দোযখই তোমাদের অভিভাবক। সে-ই তোমাদের যথোপযুক্ত তত্বাবধান করবে।

২৮. এখানেও "ঈমান গ্রহণকারী" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু তা দ্বারা সব মুসলমানকে বুঝানো হয়নি, বরং মুসলমানদের সে বিশেষ গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে যারা ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে শামিল হয়েছিলো এবং তা সত্ত্বেও ইসলামের জন্য তাদের মনে কোন দরদ ছিল না। তারা নিজ চোখে দেখছিলো সমস্ত কুফরী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছে, মু'মিনদের ক্ষুদ্র একটি দলকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আরব ভূমির বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার বানানো হচ্ছে। দেশের নানা স্থান থেকে নির্যাতিত মুসলমানরা নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আশ্রয়লাভের জন্য মদীনার দিকে ছুটে আসছে। এসব মজলুমদের সহায়তা দিতে দিতে সত্যিকার মুসলমানদের কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এরাই আবার জীবন বাজি রেখে শত্রুর মোকাবিলা করছে। কিন্তু এসব দেখে ঈমানের দাবীদার এ লোকগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তনই অসছে না। এ জন্য তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা কেমন ঈমানদার? ইসলামের জন্য পরিস্থিতি নাজুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আল্লাহর কথা শুনে তোমাদের অন্তর বিগলিত হবে, তাঁর দীনের জন্য তোমাদের অন্তরে ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব প্রবল হবে এবং সে জন্য প্রাণপাত করতে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে, এখনো কি তোমাদের জন্য সে সময় আসেনি? ঈমান গ্রহণকারীরা কি এমনই হয়ে থাকে যে, আল্লাহর দীনের জন্য চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির দেখা দিলেও সেজন্য সামান্যতম দরদও অনুভব করবে না? আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা আপন স্থান থেকে একটুও নড়বে না? আল্লাহ তাঁর নাযিলকৃত কিতাবে নিজে দান করার জন্য আহবান জানিয়ে তাকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং স্পষ্টভাবে এও জানিয়ে দেবেন যে, এ পরিস্থিতিতে যারা তাদের অর্থ সম্পদকে আমার দীনের চেয়ে প্রিয় মনে করবে তারা মু'মিন নয়, মুনাফিক—এতেও তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপেও উঠবে না, তাঁর নির্দেশের আগে তাদের মাথাও নত হবে না?

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

দান সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ[৩১] এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে[৩২] তারাই তাদের রবের কাছে 'সিদ্দীক'[৩৩] ও 'শহীদ'[৩৪] বলে গণ্য। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে।[৩৫] আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের বাসিন্দা।

২৯. অর্থাৎ নবীদের তিরোধানের শত শত বছর পর তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেতনাহীন, মৃত আত্মা এবং নৈতিকভাবে মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমাদের রসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান, আল্লাহর কিতাব নাযিল হচ্ছে, তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর দীর্ঘ দিনও অতিবাহিত হয়নি, অথচ তোমাদের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যাচ্ছে, শত শত বছর ধরে আল্লাহর দীন ও তাঁর আয়াত নিয়ে খেল তামাশা করতে থাকার পর ইহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা যা হয়েছে।

৩০. এখানে যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। কুরআন মজীদে বেশ কিছু জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির বরকতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টিপাত যে কল্যাণ বয়ে আনে নবুওয়াত এবং কিতাবও মানবজাতির জন্য সে একই রকমের কল্যাণ বয়ে আনে। মৃত ভূ-পৃষ্ঠে যেমন রহমতের বৃষ্টির এক বিন্দু পড়তেই শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আল্লাহর রহমতে যে দেশে নবী প্রেরিত হন এবং অহী ও কিতাব নাযিল হওয়া শুরু হয় সেখানে মৃত মানবতা অকস্মাত জীবন লাভ করে। তার এমন সব প্রতিভা ও গুণাবলীর বহিপ্রকাশ ঘটতে থাকে, যা জাহেলিয়াত দীর্ঘদিন থেকে মাটিতে মিশিয়ে রেখেছিলো। তার মধ্য থেকে মহত নৈতিক চরিত্রের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হতে থাকে এবং কল্যাণ ও সৎকর্মের ফুলবাগিচা শ্যামলিমায় ভরে ওঠে। এখানে যে উদ্দেশ্যে এ সত্যটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হচ্ছে, দুর্বল ঈমান মুসলমানদের চোখ যেন খুলে যায় এবং তারা যেন নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে দেখে। নবুওয়াত ও অহীর কল্যাণময় বৃষ্টিধারা থেকে মানবতার মধ্যে যেভাবে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিলো এবং যেভাবে তার আঁচল কল্যাণে ভরে উঠছিলো তা তাদের জন্য সুদূর অতীতের কোন কাহিনী ছিল না। সাহাবা কিরামের (রা) পূত পবিত্র সমাজে তারা নিজ চোখে তা দেখছিলো। এ ব্যাপারে তারা দিনরাত সর্বক্ষণ

অভিজ্ঞতা লাভ করছিলো। জাহেলিয়াতও তার সমস্ত অকল্যাণসহ তাদের সামনে বর্তমান ছিল এবং জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম থেকে যে গুণাবলী ও কল্যাণ উৎসারিত হয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হচ্ছিলো। তাই এসব বিষয় তাদেরকে বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব, মৃত ভূ-পৃষ্ঠকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের বারিধারা দ্বারা কিভাবে জীবন দান করেন তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে তার নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণে সেদিকে শুধু ইংগিত করাই যথেষ্ট ছিল। এখন তোমরা বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখ যে, এ নিয়ামত দ্বারা তোমরা কতখানি উপকৃত হচ্ছো।

৩১. বাংলা ভাষায় صدقه (সাদকা) শব্দটি অত্যন্ত খারাপ অর্থে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় 'সাদকা' বলা হয় এমন দানকে যা সরল মনে খাঁটি নিয়তে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হয়। যার মধ্যে কোন প্রদর্শনীর মনোভাব থাকে না, কাউকে উপকার করে খোঁটা দেয়া হয় না। দানকারী তার রবের দাসত্ব ও আনুগত্যের খাঁটি মনোবৃত্তি পোষণ করেন বলেই দেন। এ শব্দটি صدق শব্দটি থেকে গৃহীত। তাই এর পেছনে কাজ করে সততা। কোন দান বা কোন অর্থ ব্যয় ততক্ষণ 'সাদকা' বলে গণ্য হয় না যতক্ষণ তার মধ্যে "ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ" আল্লাহর পথে ব্যয় করার খাঁটি নিয়ত এবং নির্ভেজাল আবেগ ও ভাবধারা কার্যকর না থাকে।

৩২. এখানে ঈমান গ্রহণকারী অর্থ সেসব লোক যারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং যাদের কর্মপদ্ধতি ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ও দুর্বল ঈমানের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সে সময় যারা একে অন্যের তুলনায় অধিক আর্থিক কুরবানী পেশ করছিলো এবং আল্লাহর দীনের জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

৩৩. এটি صدق শব্দের অর্থের আধিক্য প্রকাশক শব্দ। صادق অর্থ সত্যবাদী এবং صديق অর্থ অতিশয় সত্যবাদী। কিন্তু একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, صدق কেবল সত্য ও বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাকেই বলে না। যে কথা যথাস্থানে সত্য, যার বক্তা মুখে যা বলছে অন্তরেও সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কেবল সে কথার ক্ষেত্রেই এ শব্দটি প্রযোজ্য। যেমন ঃ কেউ যদি বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, তা হলে তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা। কারণ তিনি তো সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর রসূল। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে একথার ক্ষেত্রে কেবল তখনই সত্যবাদী বলা যাবে যখন সে বিশ্বাস করবে যে, সত্যই তিনি আল্লাহর রসূল। সুতরাং কোন কথা সত্য হতে হলে প্রয়োজন বাস্তবের সাথে এবং বক্তার মন ও বিবেকের সাথে তার মিল থাকা। অনুরূপভাবে صديق শব্দের অর্থের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সরলতা এবং বাস্তব কাজ কর্মে সততাও অন্তরভুক্ত। صادق الوعد (প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী) সে ব্যক্তিকে বলা হবে যে কার্যত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। صديق (সত্যিকার বন্ধু) তাকেই বলা হবে যে বিপদের সময় বন্ধুত্বের হক আদায় করেছে এবং কেউ কখনো তার থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। যুদ্ধে صادق فى القتال (খাঁটি সৈনিক) কেবল সেই ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তার কাজ দ্বারা নিজের বীরত্ব প্রমাণ করেছে। বক্তার কাজ তার কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাও صدق শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত। যে ব্যক্তি তার কথার পরিপন্থী কাজ করে তাকে সত্যবাদী বলা

যেতে পারে না। এ কারণে যে ব্যক্তি বলে এককথা কিন্তু করে ভিন্ন কিছু, তাকে সবাই মিথ্যাবাদী বলে। এখন ভেবে দেখা দরকার যে, صدق ও صادق শব্দের অর্থ যেখানে এই সেখানে صديق (অতিশয় সত্যবাদী) এ আধিক্য প্রকাশক শব্দটি বলার অর্থ কি হবে। এর অনিবার্য অর্থ হবে এমন সত্যবাদী লোক যার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, যে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। যার নিকট থেকে বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কথা আশাই করা যায় না, যে কোন কথা মেনে নিয়ে থাকলে পূর্ণ সততার সাথেই মেনে নিয়েছে, যথার্থভাবে তা পালন করেছে এবং নিজের কাজ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, একজন মান্যকারীকে বাস্তবে যা হওয়া উচিত সে তেমনি একজন মান্যকারী (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা–৯৯)।

৩৪. এ আয়াতের তাফসীরে বড় বড় মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক, দাহ্হাক, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান প্রমুখ মুফাসসিরদের মতে أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ পর্যন্ত একটি বাক্য শেষ হয়েছে। এরপর وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ পর্যন্ত কথাগুলো একটা স্বতন্ত্র বাক্য। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে তারাই 'সিদ্দীক'। আর শহীদদের জন্য তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে। পক্ষান্তরে মুজাহিদ এবং আরো কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ পুরা বক্তব্যকে একটা বাক্য বলে মনে করেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে তাই যা আমি ওপরে আয়াতের অনুবাদে লিখেছি। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতার কারণ হচ্ছে, প্রথমোক্ত দল শহীদ বলতে আল্লাহর পথে নিহতদের বুঝেছেন। তারা এও দেখছেন যে, প্রত্যেক মু'মিন আল্লাহর পথে নিহত হয় না। তাই তারা وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ কথাটিকে একটি পূর্ণাংগ বাক্য ধরে নিয়েছেন। কিন্তু শেষোক্ত দলটি 'শহীদ'কে আল্লাহর পথে নিহত অর্থে গ্রহণ করেননি, বরং সত্যের সাক্ষদাতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। এ বিচারে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মু'মিনই শহীদ হিসেবে গণ্য। আমাদের এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। কুরআন ও হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة : ١٤٣)

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।" (আল বাকারা ১৪৩)।

هُوَ سَمَّٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলমান। এ কুরআনেও (তোমাদের এ নাম–ই রাখা হয়েছে।) যেন রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন আর তোমরাও মানুষের জন্য সাক্ষী হও।" (আল হজ্জ ৭৮)।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ
نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ
اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

ভালভাবে জেনে রাখো দুনিয়ার এ জীবন, একটা খেলা, হাসি তামাসা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩৬] দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো[৩৭] —তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত।[৩৮] তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন যে, مُؤْمِنُوْا اُمَّتِىْ شُهَدَاءُ "আমার উম্মতের মু'মিনগণই শহীদ।" তারপর নবী (সা) সূরা হাদীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন (ইবনে জারীর)। ইবনে মারদুইয়া হযরত আবুদ দারদা থেকে এই একই অর্থের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من فر بدينه من ارض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقا فاذا مات قبضه الله شهيدا ثم تلا هذه الاية –

"যে ব্যক্তি তার প্রাণ ও দীন বিপন্ন হবে ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এ আশংকায় কোন দেশ বা ভূ-খণ্ড ছেড়ে চলে যায় তাকে আল্লাহর কাছে 'সিদ্দীক' বলে লেখা হয়। আর সে যখন মারা যায় তখন আল্লাহ শহীদ হিসেবে তার রূহ কবজ করেন। একথা বলার পর নবী (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (শাহাদাতের এই অর্থ বিশদভাবে বুঝার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৪৪, আন নিসা, টীকা ৯৯, আল আহযাব, টীকা ৮২)।

৩৫. অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যে যে মর্যাদার পুরস্কার ও যে মর্যাদার 'নূরের' উপযুক্ত হবে সে তা পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরস্কার ও 'নূর' লাভ করবে। তাদের প্রাপ্য অংশ এখন থেকেই তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

৩৬. এ বিষয়টি পুরোপুরি বুঝার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে ঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪-১৫, ইউনুস, আয়াত ২৪, ২৫, ইবরাহীম ১৮, আল কাহাফ, ৪৫-৪৬, আন নূর ৩৯। এসব স্থানে মানুষের মনে যে বিষয়টি বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এ পৃথিবীর জীবন প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষণস্থায়ী জীবন। এখানকার বসন্তকাল যেমন অস্থায়ী তেমনি শরতকালও অস্থায়ী। এখানে চিত্তহরণের বহু উপকরণ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এত নিকৃষ্ট এবং এত নগণ্য যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে মানুষ ঐগুলোকে বড় বড় জিনিস বলে মনে করে এবং প্রতারিত হয়ে মনে করে ঐগুলো লাভ করতে পারাই যেন চরম সফলতা অর্জন করা। অথচ যেসব বড় বড় স্বার্থ এবং আনন্দের উপকরণই এখানে লাভ করা সম্ভব তা নিতান্তই নগণ্য এবং কেবল কয়েক বছরের ধার করা জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার অবস্থাও আবার এমন যে, ভাগ্যের একটি বিপর্যয় ও বিড়ম্বনা এ পৃথিবীতেই ওগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন এক বিশাল ও স্থায়ী জীবন। সেখানকার কল্যাণও বিশাল ও স্থায়ী এবং ক্ষতিও বিশাল এবং স্থায়ী। সেখানে কেউ যদি আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি পেয়ে যায় তাহলে সে চিরদিনের জন্য এমন নিয়ামত লাভ করলো যার সামনে গোটা পৃথিবীর ধন-সম্পদ এবং রাজত্বও অতিশয় নগণ্য ও হীন। আর সেখানে যে আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হলো, সে যদি দুনিয়াতে এমন কিছুও পেয়ে যায় যা সে নিজে বড় মনে করতো। তবুও সে বুঝতে পারবে যে, সে ভয়ানক ক্ষতিকর কারবার করেছে।

৩৭. মূল আয়াতে سابقوا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু দৌড়াও কথা দ্বারা এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। مسابقت শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতায় অন্যদের পেছনে ফেলে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর ধন-সম্পদ, আনন্দ ও সুখ এবং কল্যাণসমূহ হস্তগত করার জন্য যে চেষ্টা করেছো তা পরিত্যাগ করে এ জিনিসকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নাও এবং এ দিকে দৌড়িয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করো।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿٢٣﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে[৩৯] একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি।[৪০] এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ।[৪১] (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনক্ষুণ্ন না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন। সেজন্য গর্বিত না হও।[৪২] যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়[৪৩] আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এর পরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।[৪৪]

৩৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ । কোন কোন মুফাসসির عرض শব্দটিকে প্রস্থ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে এ শব্দটি বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় عرض শব্দটি দৈর্ঘ্যের বিপরীত প্রস্থ বুঝাতেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, বরং শুধুমাত্র বিস্তৃতি বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে বলা হয়েছে فَذُوْدُعَاءٍ عَرِيْضٍ "মানুষ তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে (হা মীম, আস সাজদা ৫১)। এক্ষেত্রে একথাও বুঝে নিতে হবে যে, একথা দ্বারা জান্নাতের আয়তন বুঝাতে চাওয়া হয়নি, বরং তার বিস্তৃতির ধারণা দিতে চাওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত ব্যাপক। আর সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (اية ١٣٣)

"দৌড়াও তোমাদের রবের মাগফিরাত ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি গোটা বিশ্ব–জাহান জুড়ে, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" (আয়াত ১৩৩)।

এ দু'টি আয়াত এক সাথে পড়লে মাথায় এমন একটা ধারণা জন্মে যে, একজন মানুষ জান্নাতে যে বাগান এবং প্রাসাদসমূহ লাভ করবে তার অবস্থান স্থল কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব–জাহান হবে তার বিচরণ ক্ষেত্র। সে কোথাও সীমাবদ্ধ থাকবে না। সেখানে তার অবস্থা এ পৃথিবীর মত হবে না যে, চাঁদের মত সর্বাধিক নিকটবর্তী উপগ্রহ পর্যন্ত পৌছতেও তাকে বছরের পর বছর ধরে একের পর এক বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং এ সামান্য পথ ভ্রমণের কষ্ট দূর করার জন্য অজস্র সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানে গোটা বিশ্ব–জাহান তার জন্য উন্মুক্ত হবে, যা চাইবে নিজের জায়গায় বসে বসেই দেখতে পারবে এবং যেখানে ইচ্ছা বিনা বাধায় যেতে পারবে।

৩৯. 'তাকে' কথাটি দ্বারা মুসিবতের প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে, পৃথিবীর প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে, নিজেদের কথাটির প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে এবং বাক্যের ধারা অনুসারে সৃষ্টিকূলের প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে।

৪০. কিতাব অর্থ ভাগ্য লিপি।

৪১. অর্থাৎ নিজের সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেকের ভাগ্য আগেই লিখে দেয়া আল্লাহর জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

৪২. বর্ণনায় এই ধারাবাহিকতার মধ্যে যে উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলা হয়েছে তা বুঝার জন্য এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় ঈমানদারগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন তা সামনে রাখা দরকার। প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের হামলার আশংকা একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহ, সর্বদা অবরোধ পরিস্থিতি, কাফেরদের অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে চরম দুরবস্থা, গোটা আরবের সর্বত্র ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতন এ পরিস্থিতির মধ্যে তখনকার মুসলমানদের সময় অতিবাহিত হচ্ছিলো। কাফেররা একে মুসলমানদের লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত হওয়ার প্রমাণ মনে করতো। এ পরিস্থিতিকে মুনাফিকরা তাদের সন্দেহের সমর্থনে ব্যবহার করতো। আর একনিষ্ঠ মু'মিনগণ যদিও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিলেন। তবুও বিপদ মসিবতের আধিক্য কোন কোন সময় তাদের জন্য৩ চরম ধৈর্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ কারণে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে, তোমাদের ওপর কোন বিপদই তোমাদের রবের অবগতির বাইরে নাযিল হয়নি। যা কিছু হচ্ছে তা সবই আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হচ্ছে– যা তাঁর দফতরে লিখিত আছে। তোমাদের প্রশিক্ষণের জন্যই এসব সঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অগ্রসর করানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দিয়ে যে বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে চান তার জন্য এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এসব পরীক্ষা ছাড়াই যদি তোমাদেরকে সফলতার স্বর্ণ দুয়ারে পৌছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের চরিত্রে এমন সব দুর্বলতা থেকে যাবে যার কারণে তোমরা না পারবে মর্যাদা ও ক্ষমতার গুরুপাক খাদ্য হজম করতে, না পারবে বাতিলের প্রলয়ংকরী তুফানের চরম আঘাত সহ্য করতে।

৪৩. সে সময় মুসলিম সমাজের মুনাফিকদের যে চরিত্র সবারই চোখে পড়ছিলো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক স্বীকারোক্তি অনুসারে মুনাফিক ও খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকার

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৪৫] *আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে।*[৪৬] *এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।*[৪৭]

কারণে খাঁটি ঈমানদারদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো তারা তাতে শামিল হয়নি। তাই তাদের অবস্থা ছিল এই যে, আরবের অতি সাধারণ একটা শহরে যে নাম মাত্র স্বচ্ছলতা ও পৌরহিত্য তারা লাভ করেছিলো তাতেই তারা যেন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিলো এবং ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। তাদের মনের সংকীর্ণতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, যে রসূলের অনুসারী হওয়ার এবং যে দীন মানার দাবী করতো, তার জন্য নিজেরা একটি পয়সাও ব্যয় করবে কি, অন্য দাতাদেরও একথা বলে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতো যে, তোমরা নিজের অর্থ এভাবে অপচয় করছো কেন? স্পষ্ট কথা, দুঃখ কষ্টের উত্তপ্ত অগ্নি কুণ্ডে যদি জ্বালানো না হতো, তাহলে এই কৃত্রিম পদার্থগুলো—যা আল্লাহর কোন কাজে লাগার মত ছিল না—খাঁটি সোনা থেকে পৃথক করা যেতো না। আর তাকে আলাদা করা ছাড়া দুর্বল ও খাঁটি মুসলমানদের এই সংমিশ্রিত সমাবেশকে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ মহান পদটি অর্পণ করা যেতো না, যার বহুবিধ মহতী কল্যাণ খিলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়া অবলোকন করেছিলো।

৪৪. অর্থাৎ উপদেশবাণী শোনার পরও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পন্থা অবলম্বন না করে এবং নিজের বক্রতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় যা আল্লাহ অপছন্দ করেন—তাহলে আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই। তিনি অভাব শূন্য, এসব লোকের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন আটকে নেই, আর তিনি অতিশয় প্রশংসিত, তাঁর কাছে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকেরাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। দুষ্কর্মশীল লোকেরা তাঁর কৃপা দৃষ্টিলাভের উপযুক্ত হতে পারে না।

৪৫. এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে নবী–রসূলদের মিশনের পুরা সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যত রসূল এসেছেন, তারা সবাই তিনটি বিষয় নিয়ে এসেছিলেন ঃ

এক ঃ بينات অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা থেকে স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হচ্ছিলো যে, তাঁরা সত্যিই আল্লাহর রসূল। তাঁরা নিজেরা রসূল সেজে বসেননি। তাঁরা যা সত্য বলে পেশ করছেন তা সত্যিই সত্য আর যে জিনিসকে বাতিল বলে উল্লেখ করেন তা যে সত্যিই বাতিল তা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের পেশকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। সুস্পষ্ট হিদায়াতসমূহ, যাতে কোন সন্দেহ–সংশয় ছাড়া বলে দেয়া হয়েছিল—আকায়েদ, আখলাক, ইবাদাত–বন্দেগী এবং আদান–প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক পথ কি–যা তারা অনুসরণ করবে এবং ভ্রান্ত পথসমূহ কি যা তারা বর্জন করবে।

দুই ঃ কিতাব, মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক নির্দেশনা এতে বর্তমান যাতে মানুষ পথ নির্দেশনার জন্য তার স্মরণাপন্ন হতে পারে।

তিন ঃ মিযান, অর্থাৎ হক ও বাতিলের মানদণ্ড যা দাঁড়ি পাল্লার মতই সঠিকভাবে ওজন করে বলে দিবে চিন্তা ও ধ্যান–ধারণা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতার বিভিন্ন চরম পন্থার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কোন্‌টি।

নবী–রসূলদেরকে এ তিনটি জিনিস দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের আচরণ এবং মানব জীবনের বিধি–বিধান ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবেও যেন ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একদিকে প্রতিটি মানুষ তার আল্লাহর অধিকার, নিজের অধিকার এবং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অধিকার সঠিকভাবে জানবে এবং ইনসাফের সাথে আদায় করবে যার সাথে কোন না কোনভাবে তাকে জড়িত হতে হয়। অপর দিকে সামাজিক জীবনের বিধি–বিধান এমন নীতিমালার ওপর নির্মাণ করতে হবে যাতে সমাজে কোন প্রকার জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়, সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সবাই যেন ইনসাফ মত যার যার অধিকার লাভ করে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। অন্য কথায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল নবী–রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। তারা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন, যাতে তার মন–মগজ, তার চরিত্র ও কর্ম এবং তার ব্যবহারে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তারা গোটা মানব সমাজেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি উভয়েই পরস্পরের আত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও সাংঘর্ষিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়।

৪৬. লোহা নাযিল করার অর্থ মাটির অভ্যন্তরে লোহা সৃষ্টি করা। যেমন কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে। وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ

তিনি তোমাদের জন্য গবাদী পশুর আটটি জোড়া নাযিল করেছেন (আয যুমার ৬)। পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় তা যেহেতু আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়নি, আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছে। সুতরাং কুরআন মজীদে তা সৃষ্টি করাকে নাযিল করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী-রসূলদের মিশন কি তা বর্ণনা করার পর পরই আমি লোহা নাযিল করেছি, তার মধ্যে বিপুল শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। বলায় আপনা থেকেই এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে লোহা অর্থে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু একটা পরিকল্পনা পেশ করার উদ্দেশ্যে রসূলদের পাঠান নাই। কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো ও সে উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করাও তাদের মিশনের অন্তরভুক্ত ছিল। যাতে এ প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনকারীদের শাস্তি দেয়া যায় এবং এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টিকারীদের শক্তি নির্মূল করা যায়।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ দুর্বল, তিনি আপন শক্তিতে এ কাজ করতে সক্ষম নন, তাই তার সাহায্য প্রয়োজন, ব্যাপারটা তা নয়। তিনি মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ কর্ম পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ তার উন্নতি ও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সব সময় এ ক্ষমতা আছে যে, যখন ইচ্ছা তিনি তাঁর একটি ইংগিতেই সমস্ত কাফেরকে পরাস্ত করে তাঁদের ওপর তাঁর রসূলদের আধিপত্য দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে রসূলদের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের কি কৃতিত্ব থাকবে যে, তারা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? তাই আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে তাঁর বিজয়ী শক্তির সাহায্যে আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর রসূলদেরকে 'বাইয়েনাত' স্পষ্ট নিদর্শনাদী, কিতাব ও মিযান দিয়ে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের সামনে ন্যায়নীতির বিধান পেশ করেন এবং জুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। মানুষকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যার ইচ্ছা রসূলদের দাওয়াত কবুল করবে এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে। যারা কবুল করলো তাদের আহবান জানিয়েছেন; এসো, এই ন্যায়বিচারপূর্ণ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে আমার ও আমার রসূলদের সহযোগী হও এবং যারা জুলুম ও নির্যাতনমূলক বিধান টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করো। আল্লাহ তা'আলা এভাবে দেখতে চান, মানুষের মধ্যে কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের বাণী প্রত্যাখ্যান করে, আর কারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মোকাবিলায় বে-ইনসাফী কায়েম রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ইনসাফের বাণী গ্রহণ করার পর তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সে উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর কারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁরই কারণে এই ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণ-সম্পদও বাজি রাখছে। যারা এ পরীক্ষায় সফল হবে, ভবিষ্যতে তাদের জন্যই বহুবিধ উন্নতির পথ খুলে যাবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا
الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

আমি[৪৮] নূহকে ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রচলন করেছিলাম[৪৯]। তারপর তাদের বংশধরদের কেউ কেউ হিদায়াত গ্রহণ করেছিল এবং অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিল[৫০]। তাদের পর আমি একের পর এক আমার রসূলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মারয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, তাকে ইনজীল দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি[৫১]। আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে[৫২]। আমি ওটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়ে নিয়েছে[৫৩]। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি[৫৪]। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী।

৪৮. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যে রসূলগণ 'বাইয়েনাত' কিতাব ও মিযান নিয়ে এসেছিলেন তাদের অনুসারীদের মধ্যে কি বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তাই বলা হচ্ছে।

৪৯. অর্থাৎ যে রসূলই কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তারা হযরত নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তীগণ হযরত ইবরাহীমের বংশধর ছিলেন।

৫০. অর্থাৎ অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলো এবং আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

৫১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে رافت ও رحمت। এ দু'টি শব্দ প্রায় সমার্থক কিন্তু দু'টি শব্দই যখন একসাথে বলা হয় তখন رافت এর অর্থ হয় মনের নম্র ও সদয়

অনুভূতি যা কাউকে দুঃখ কষ্ট ও বিপদের মধ্যে দেখে কারো মনে সৃষ্টি হয়। আর رحمت অর্থ সেই আবেগ যার কারণে সে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহ প্রবন ছিলেন। তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তাঁর চরিত্রের এ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো। যার কারণে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তাদের মনে দয়া সৃষ্টি হতো এবং সহানুভূতির সাথে তাদের সেবা করতো।

৫২. এ শব্দটির উচ্চারণ 'রাহবানিয়াত' ও 'রুহ্‌বানিয়াত' দুই রকমই করা হয়ে থাকে। এর শব্দমূল رهب যার অর্থ হচ্ছে ভয়। রাহবানিয়াত অর্থ ভীত হওয়ার পথ ও পন্থা এবং রুহ্‌বানিয়াত অর্থ ভীতদের পথ ও পন্থা। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ভয়ের কারণে কোন ব্যক্তির (কারো জুলুম নির্যাতনের ভয়ে হোক বা দুনিয়ার ফিতনার ভয়ে হোক কিংবা নিজের প্রবৃত্তির দুর্বলতার ভয়ে হোক) দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার জীবন থেকে পালিয়ে বন–জংগলে বা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া কিংবা নির্জন নিভৃতে যেয়ে বসা।

৫৩. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে আমি তাদের জন্য রাহ্‌বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ ফরয করেছিলাম না। বরং আমি তাদের ওপর যা ফরয করেছিলাম তা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। আর অপর অর্থটি হচ্ছে, এ বৈরাগ্যবাদ আমার ফরযকৃত ছিল না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তারা তা নিজেরাই নিজেদের ওপর ফরয করে নিয়েছিলো। দু'টি অবস্থাতেই এ আয়াতটি একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, বৈরাগ্যবাদ একটি অনৈসলামিক রীতি। এটি কখনো দীনে ইসলামের অংগীভূত ছিল না। এ প্রসংগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই" (মুসনাদে আহমদ)। অন্য একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ رَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর পথে জিহাদই হচ্ছে এ উম্মতের বৈরাগ্যবাদ।" (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অর্থাৎ দুনিয়া বর্জন করা এ উম্মতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নয়, বরং এর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এ উম্মত ফিতনার ভয়ে ভীত হয়ে বন–জংগল ও পাহাড়–পর্বতে পালিয়ে যায় না বরং আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে। বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সাহাবীদের একজন বললেন ঃ আমি সব সময় সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনো বিরতি দেব না। তৃতীয় জন বললো, আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং নারীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবো না। তাদের এসব কথা শুনতে পেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى و ارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى –

"আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলি। আমার নীতি হলো, আমি রোযা রাখি এবং রোযা না রেখেও

থাকি, রাতের বেলা নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। যে আমার নীতি পছন্দ করে না তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

হযরত আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لاَ تُشَدِّدُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَانَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِم فَتِلْكَ بَقَايَا هُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَار -

"নিজের প্রতি কঠোর হয়ো না তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন। একটি কওম কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। দেখে নাও, তারা এবং তাদের অবশিষ্টরা গীর্জা ও উপাসনালয়ে বর্তমান।"

(আবু দাউদ)।

৫৪. অর্থাৎ তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্য বাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তার হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার গযব খরিদ করে নিয়েছে।

এ বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হলে খৃস্টীয় বৈরাগ্যবাদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে নেয়া দরকার।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর খৃস্টান গীর্জাসমূহ দুই'শ বছর পর্যন্ত বৈরাগ্যবাদের সাথে অপরিচিত ছিল। কিন্তু শুরু থেকেই খৃস্টান ধর্মে এর বিষাক্ত জীবাণু বিদ্যমান ছিল এবং যেসব ধ্যান–ধারণা এর জন্ম দেয় তাও এর মধ্যে বর্তমান ছিল। সংসার বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপনকে নৈতিক আদর্শ মনে করা এবং বিয়ে শাদী ও পার্থিব কায় কারবারমূলক জীবনের তুলনায় দরবেশী জীবন ধারাকে অধিক উন্নত ও ভাল মনে করাই বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি। খৃস্টান ধর্মে এ দু'টি জিনিস শুরু থেকেই ছিল। বিশেষ করে কৌমার্য বা নিসঙ্গ জীবন যাপনকে পবিত্রতার সম পর্যায়ের মনে করার কারণে গীর্জায় ধর্মীয় কাজ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্য বিয়ে করা, তাদের সন্তানাদি থাকা এবং সাংসারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াকে অপছন্দনীয় মনে করা হতো। তৃতীয় শতাব্দীর আগমনের পূর্বেই এটি একটি ফিতনার রূপ ধারণ করে এবং বৈরাগ্যবাদ মহামারীর আকারে খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এর তিনটি বড় কারণ ছিল।

একটি কারণ হচ্ছে, প্রাচীন মুশরিক সমাজে যৌনতা, চরিত্রহীনতা ও দুনিয়া পূজা যে চরম আকারে বিস্তার লাভ করেছিল তা উচ্ছেদ করার জন্য খৃস্টান পাদ্রীরা মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে চরম পন্থার নীতি গ্রহণ করে। তারা সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর এমন গুরুত্ব আরোপ করে যে, বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হলেও তা মূলত অপবিত্র বলে গণ্য হয়। তারা দুনিয়া পূজার বিরুদ্ধে এমন কঠোরতা অবলম্বন করে যে, একজন দীনদার ও ধর্মভীরু লোকের পক্ষে কোন প্রকার সম্পদের মালিক হওয়া গোনাহর

কাজ বলে গণ্য হয় এবং একেবারে নিসম্বল ও সব দিক দিয়ে দুনিয়াত্যাগী হওয়াটাই ব্যক্তির জন্য নৈতিক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ মুশরিক সমাজের ভোগবাদী নীতির প্রতিবাদে তারা এমন চরম পন্থার আশ্রয় নেয় যে, ভোগ সুখ বর্জন, যৌন বাসনাকে হত্যা করা এবং প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করাই নৈতিকতার উদ্দেশ্য হয়ে যায় এবং নানা রকম সাধনা দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেয়াই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও তার প্রমাণ হিসেবে মনে করা হতে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, খৃষ্ট ধর্ম যখন সফলতার যুগে প্রবেশ করে এবং জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে, গীর্জা তখন তার ধর্মের প্রসার ও প্রচারের আকাংখায় জনপ্রিয় প্রতিটি খারাপ জিনিসকেও তার গণ্ডিভুক্ত করতে থাকে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পূজা প্রাচীন উপাস্যদের স্থান দখল করে নেয়। হোরাস (HORUS) ও আইসিস (ISIS) এর মূর্তির বদলে যীশু ও মারয়ামের মূর্তির পূজা শুরু হয়। স্যাটারনেলিয়া (Saturnalia) এর পরিবর্তে বড় দিনের উৎসব পালন শুরু হয়। খৃষ্টান দরবেশগণ প্রাচীন যুগের তাবিজ ও বালা পরা, আমল-তদবীর করা, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় ও অদৃশ্য বলা, জিন ভূত তাড়ানোর আমল সব কিছুই করতে শুরু করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি নোংরা, অপরিষ্কার ও উলঙ্গ থাকতো এবং কোন কুঠরি বা গুহায় বসবাস করতো জনগণ যেহেতু তাকে ধার্মিক মনে করতো তাই খৃষ্টান গীর্জাসমূহ এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বা ওলী হওয়ার একমাত্র পথ বলে ধরে নেয়া হয়। এ ধরনের লোকদের 'কারামত' বা অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের কাহিনী দ্বারা খৃষ্টানদের মধ্যে তাযকিরাতুল আওলিয়া ধরনের প্রচুর বই-পুস্তক বহুল প্রচারিত হয়।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে ধর্মের সীমা নির্ণয়ের জন্য খৃষ্টানদের কাছে কোন বিস্তারিত শরীয়াত এবং কোন সুস্পষ্ট 'সুন্নাত' বর্তমান ছিল না। মূসার শরীয়াতকে তারা পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু এককভাবে শুধু ইনজীলের মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনামা ছিল না। এ কারণে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ কিছুটা বাইরের দর্শন ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কিছুটা নিজেদের মানসিক প্রবণতার কারণে ধর্মের মধ্যে নানা ধরনের বিদআতকে অন্তরভুক্ত করতে থাকে। বৈরাগ্যবাদ ওই সব বিদআতেরই একটি। খৃষ্টান ধর্মের পণ্ডিত পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ ধর্মের দর্শন ও এর কর্মপদ্ধতি বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু, হিন্দু যোগী-সন্নাসী, প্রাচীন মিসরীয় সংসার ত্যাগী (Anchorits) সন্নাসী, পারস্যের মানেবীয়া এবং প্লেটো ও প্লেটোনিক দর্শনের অনুসারীদের থেকে গ্রহণ করেছে এবং একেই আত্মার পরিশুদ্ধির পন্থা, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের অসীলা হিসেবে গণ্য করেছে। যারা এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছিল তারা কোন সাধারণ লোক ছিল না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী (অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার সময়) পর্যন্ত তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খৃষ্ট ধর্মের বড় বড় পণ্ডিত-পুরোহিত এবং ধর্মীয় নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিল। অর্থাৎ সেন্ট আথানাসিউয়াস, সেন্ট বাসেল, সেন্ট গ্রেগরী নাযিয়ানযীন, সেন্ট কারাই সুষ্টাম, সেন্ট আয়ম ব্রোজ, সেন্ট জিরুম, সেন্ট অগাষ্টাইন, সেন্ট বেনডিক্ট, মহান গ্রেগরী। এঁরা সবাই ছিলেন সংসার বিরাগী দরবেশ এবং বৈরাগ্যবাদের বড় প্রবক্তা। এদের প্রচেষ্টায়ই গীর্জাসমূহে বৈরাগ্যবাদ চালু হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের সূচনা হয় মিসর থেকে। সেন্ট এন্থনী (St. Anthony) ছিলেন এর প্রবর্তক। তিনি ২৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৫০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁকেই সর্ব প্রথম খৃষ্টান দরবেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি 'কাইয়ুম' অঞ্চলে 'পাসপীর' নামক স্থানে (যা বর্তমানে দাইর আল-মাইমূন নামে পরিচিত) প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি লোহিত সাগরের তীরে দ্বিতীয় খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকে বর্তমানে দাইর মার আনতিনিউস বলা হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের মৌলিক নিয়ম-কানুন তাঁর লেখা ও নির্দেশাবলী থেকেই গৃহীত হয়েছে। এভাবে সূচনা হওয়ার পর গোটা মিসরে তা প্লাবনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানে স্থানে পুরুষ ও মহিলা দরবেশ ও সংসার বিরাগীদের জন্য স্বতন্ত্র খানকাহ গড়ে ওঠে যার কোন কোনটিতে তিন হাজার পর্যন্ত দরবেশ ও সন্ন্যাসী থাকতো। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে মিসরেই পাখোমিউস নামের আরো একজন খৃষ্টান অলীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি নারী ও পুরুষ সন্ন্যাসী-দরবেশদের জন্য দশটি বড় খানকাহ নির্মাণ করেন। এরপর এ ধারা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম এ বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ গীর্জাসমূহ দুনিয়া বর্জন, নিসঙ্গ ও কুমার জীবন যাপন এবং দারিদ্র ও অভাব অনটনকে আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ মনে করতো ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাসীদের বিয়ে শাদী করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং সম্পদের মালিকানা লাভকে গোনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করতে পারতো না। অবশেষে সেন্ট আথানাসিউস (মৃত্যু ৩৭৩ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট বাসেল (মৃত্যু ৩৭৯ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট অগাস্টাইন (মৃত্যু ৪৩০ খৃষ্টাব্দ) এবং মহান গ্রেগরী (মৃত্যু ৬০৯ খৃষ্টাব্দ) এর মত ব্যক্তিদের প্রভাবে বৈরাগ্যবাদের অনেক নিয়ম-কানুন চার্চ ব্যবস্থায় যথারীতি প্রবেশ লাভ করে।

এই বৈরাগ্যবাদী বিদআতের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল। আমরা সংক্ষেপে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ কঠোর সাধনা ও নিত্য নতুন পন্থায় নিজের দেহকে নানা রকম কষ্ট দেয়া। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দরবেশই অন্যদের পেছনে ফেলার চেষ্টা করতো। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের কিস্‌সা-কাহিনীতে তাদের কামালিয়াতের যেসব বর্ণনা আছে তা কতকটা এখানে বর্ণনা করা হলো ঃ

আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট মাকারিউস তার দেহের ওপর সব সময় ৮০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো। ৬ মাস পর্যন্ত সে কর্দমাক্ত মাটিতে শয়ন করতে থাকে এবং বিষাক্ত মক্ষিকাসমূহ তার উদোম শরীরে দংশন করতে থাকে। তার সাগরেদ সেন্ট ইউসিবিউস গুরুর চেয়েও অধিক সাধনায় মগ্ন হয়। সে সব সময় ১৫০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো এবং তিনবছর পর্যন্ত একটি শুষ্ক কূপের মধ্যে অবস্থান করেছিলো। সেন্ট সাবিউস শুধু এমন জোয়ারের রুটি খেতেন যা গোটা মাস পানিতে ভিজে থাকার কারণে গন্ধযুক্ত হয়ে যেতো। সেন্ট বাইসারিউন ৪০ দিন পর্যন্ত কন্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে পড়েছিলো এবং ৪০ বছর পর্যন্ত সে মাটিতে পিঠ ঠেকায়নি। সেন্ট পাখোমিউস ১৫ বছর অপর একটি বর্ণনা অনুসারে পঞ্চাশ বছর মাটিতে পিঠ না ঠেকিয়ে অতিবাহিত করেছে। সেন্ট জন নামক একজন ওলী তিন বছর পর্যন্ত উপাসনারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুরো এই সময়টাতে সে

কখনো বসেও নাই কিংবা শয্যা গ্রহণও করে নাই। আরাম করার জন্য একটি বড় পাথরে হেলান দিত এবং প্রতি রবিবারে তার জন্য 'তাবাররুক' হিসেবে যে খাদ্য আনা হতো কেবল তাই ছিল তার খাদ্য। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইট (৩৯০–৪৪৯ খৃঃ) খৃষ্টানদের বড় বড় ওলী দরবেশদের অন্যতম। প্রত্যেক ইষ্টারের আগে সে পুরা চল্লিশ দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিত। একবার সে পুরো এক বছর পর্যন্ত এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সে তার খানকাহ থেকে বেরিয়ে একটি কূপের মধ্যে গিয়ে থাকতো। অবশেষে সে উত্তর সিরিয়ার সীমান দূর্গের সন্নিকটে ৬০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে নেয় যার ওপরের অংশের পরিধি ছিল মাত্র তিন ফুট। এরই উপরে তার জন্য একটি ঘেরা নির্মাণ করে দেয়া হয়েছিলো। এই স্তম্ভটির ওপরে সে পুরো তিনটি বছর কাটিয়ে দেয়। রোদ–বৃষ্টি ও শীত–গ্রীষ্ম সব কিছুই তার ওপর দিয়ে চলে যেতো কিন্তু স্তম্ভ থেকে সে কখনো নিচে নামতো না। তার শিষ্য সিড়ি লাগিয়ে তাকে খাবার পৌছাতো এবং তার ময়লা আবর্জনা সাফ করতো। তার পর সে একটি রশি দিয়ে নিজেকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেয়। এমনকি রশি তার শরীরের মাংসের মধ্যে ঢুকে যায়। এতে মাংসে পচন ধরে এবং তাতে পোকা পড়ে। তার ফোঁড়া থেকে যখনই কোন পোকা নীচে পড়ে যেতো তখনই সে তা উঠিয়ে ফোঁড়ার মধ্যে রাখতো এবং বলতো ঃ "আল্লাহ তোকে যা খেতে দিয়েছেন, খা।" সাধারণ খৃষ্টানরা বহুদূর দূরান্ত থেকে তার সাক্ষাত লাভের জন্য আসতো। সে মারা গেলে খৃষ্টান জনতা তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয় যে, সে খৃষ্টান অলী দরবেশদের মধ্যে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এ যুগের খৃষ্টান আওলিয়াদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা এ ধরনের দৃষ্টান্তে ভরা। অলীদের মধ্যে কারো পরিচয় ছিল এই যে, সে ৩০ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিল, তাকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি। কেউ নিজেকে একটি বড় পাথরের সাথে বেঁধে রেখেছিল। কেউ জংগলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো এবং ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতো। কেউ সব সময় ভারী বোঝা বহন করে বেড়াতো। কেউ শৃঙ্খলে নিজের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বেঁধে রাখতো। কিছু সংখ্যক অলী আবার জীব–জন্তুর গুহায়, শুষ্ক বিরান কূপে কিংবা পুরনো কবরে গিয়ে বাস করতো। আরো কিছু সংখ্যক বুযর্গ সব সময় উলঙ্গ থাকতো, লম্বা চুল দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতো এবং বুকে হেঁটে চলতো। সবখানে এ ধরনের ওলী দরবেশদের কারামতের চর্চা হতো এবং মৃত্যুর পর তাদের হাড্ডিসমূহ খানকাহসমূহে সংরক্ষণ করা হতো। আমি নিজে সিনাই পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথারাইনের খানকায় এ ধরনের হাড় গোড়ে সজ্জিত গোটা একটা লাইব্রেরী দেখেছি যেখানে এক জায়গায় ওলীদের মাথার খুলি, এক জায়গায় পায়ের হাড় এবং এক জায়গায় হাতের হাড় সাজানো ছিল। একজন ওলীর গোটা কংকালই কাঁচের আলমারীতে রাখা ছিল।

দুই ঃ তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা সব সময় নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকতো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে চরমভাবে বর্জন করে চলতো। তাদের দৃষ্টিতে গোসল করা বা শরীরে পানি লাগানো আল্লাহ ভীরুতার পরিপন্থী। দেহের পরিচ্ছন্নতাকে তারা আত্মার অপবিত্রতা বলে মনে করতো। সেন্ট আথানাসিউস অত্যন্ত ভক্তির সাথে সেন্ট এ্যানথোনীর এই বৈশিষ্টটি বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যু পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার নিজের পা

৫০ বছর পর্যন্ত সে মুখ বা পা কিছুই ধোয়নি। এক বিখ্যাত খৃষ্টান সন্ন্যাসীনী কুমারী সিলভিয়া আঙ্গুল ছাড়া জীবনভর দেহের অন্য কোন অংশে পানি লাগতে দেয়নি। একটি কনভেন্টের ১৩০ জন সন্ন্যাষিনীর প্রশংসায় লেখা হয়েছে যে, তারা কখনো নিজেদের পা ধোয়নি। আর গোসলের তো নাম শুনলেই তাদের দেহে কম্পন সৃষ্টি হতো।

তিন ঃ এ বৈরাগ্যবাদ দাম্পত্য জীবনকে কার্যত পুরোপুরি হারাম করে দেয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মমভাবে কাজ করে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সমস্ত ধর্মীয় রচনাবলী এ ধারণায় ভরা যে, নিসঙ্গ জীবন বা কৌমার্য সর্বাপেক্ষা বড় নৈতিক মূল্যবোধ। পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি যৌন সম্পর্ককে একেবারেই বর্জন করবে। এমনকি তা স্বামী–স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্ক হলেও। এমন একটি অবস্থাকে পূতঃ পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা মনে করা হতো, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি হত্যা করে এবং তার মধ্যে দৈহিক ভোগাকাংখার লেশ মাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। প্রবৃত্তিকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে এজন্য জরুরী ছিল যে, তা দ্বারা পশুত্ব শক্তি লাভ করে। তাদের কাছে ভোগ এবং গোনাহ ছিল সমার্থক। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করাও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামান্তর ছিল। সেন্ট বাসেল শব্দ করে হাসা এমনকি মুচকি হাসা পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এসব ধ্যান–ধারণার ভিত্তিতে তাদের কাছে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক একেবারেই অপবিত্র বলে গণ্য হয়েছিলো। বিয়ে তো দূরের কথা নারীর চেহারা না দেখা এবং বিবাহিত হলে স্ত্রীকে ফেলে চলে যাওয়া সন্ন্যাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। পুরুষদের মত নারীদের মনেও একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি আসমানী বাদশাহীতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে যেন চির কুমারী থাকে এবং বিবাহিতা হলে স্বামীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেন্ট জিরুমের মত বিশিষ্ট খৃষ্টান পণ্ডিত বলেন, যে নারী যীশু খৃষ্টের কারণে সন্ন্যাসিনী হয়ে সারা জীবন কুমারী থাকবে সে খৃষ্টের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আর সেই নারীর মা, খোদা অর্থাৎ খৃষ্টের শ্বাশুড়ী (Mother in law of god) হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। সেন্ট জিরুম অন্য একস্থানে বলেন ঃ "পবিত্রতার কুঠার দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনের কাষ্ঠ খণ্ড কেটে ফেলাই আধ্যাত্মিক পথের অনুসারীর সর্ব প্রথম কাজ।" এসব শিক্ষার প্রভাবে ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি হওয়ার পর একজন খৃষ্টান পুরুষ বা খৃষ্টান নারীর মধ্যে এর সর্ব প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হচ্ছে, তার মধুর দাম্পত্য জীবন চিরদিনের জন্য ধংস হয়ে যায়। আর খৃষ্টান ধর্মে যেহেতু তালাক ও বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে থেকেই স্বামী–স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। সেন্ট নাইলাস (St. Nilus) ছিল দুই সন্তানের পিতা। সে বৈরাগ্যবাদের খপ্পরে পড়লে তার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেন্ট আম্মুন (St. Ammon) বিয়ের রাতে বাসর শয্যায়ই তার নব বধুকে দাম্পত্য সম্পর্কের অপবিত্রতা সম্পর্কে উপদেশ দেয় এবং উভয়ে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আজীবন পরস্পর আলাদা থাকবে। সেন্ট এ্যালেক্সিসও (St. Alexis) এই একই কাজ করেছিল। খৃষ্টান আওলিয়া–দরবেশদের জীবন–কথা এ ধরনের কাহিনীতে ভরপুর।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ তার গণ্ডির মধ্যে তিনশত বছর পর্যন্ত কোন না কোনভাবে এ চরমপন্থী ধ্যান–ধারণা প্রতিরোধ করতে থাকে। সেই সময় একজন পাদ্রীর জন্য নিসঙ্গ বা অবিবাহিত

হওয়া জরুরী ছিল না। সে যদি পাদ্রীর পদ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার আগেই বিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে সে স্ত্রীর সাথেই থাকতে পারতো। তবে পাদ্রী হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর তার বিয়ে করা নিষেধ ছিল। তাছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে পাদ্রী নিয়োগ করা যেতো না যে কোন বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে করেছে বা যার দুই স্ত্রী আছে কিংবা যার ঘরে দাসী আছে। ক্রমান্বয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে এ ধারণা জোরদার হয়ে ওঠে যে, যে ব্যক্তি গীর্জায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে তার বিবাহিত হওয়া অত্যন্ত ঘৃণার ব্যাপার। ৩৬২ খৃষ্টাব্দের গেংরা কাউন্সিল ছিল এ ব্যাপারে সর্বশেষ সম্মেলন যেখানে এ ধরনের ধ্যান–ধারণাকে ধর্মের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এর অল্প কিছুকাল পরেই ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সিনোড (Synod) সমস্ত পাদ্রীকে পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন বৈবাহিক বন্ধন থেকে দূরে থাকে। পরের বছর পোপ সাইরিকিয়াস (Siricius) নির্দেশ জারি করে যে, যে পাদ্রী বিয়ে করবে কিংবা পূর্ব বিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবে, তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হোক। সেন্ট জিরুম, সেন্ট এ্যাম্ব্রুজ ও সেন্ট অগাষ্টাইনের মত বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষী অত্যন্ত জোরালোভাবে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং যৎ সামান্য প্রতিরোধের পর পাশ্চাত্য গীর্জাসমূহে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা চালু হয়। পূর্ব বিবাহিত লোকেরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হওয়ার পরও নিজেদের স্ত্রীর সাথে "অবৈধ" সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এ ধরনের অনেক অভিযোগ নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য সে সময় অনেকগুলো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে তাদের সংশোধনের জন্য নিয়ম করে দেয়া হয় যে, তারা উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবে, স্ত্রীদের সাথে কখনো একাকী সাক্ষাত করবে না এবং তাদের সাক্ষাতের সময় কমপক্ষে দুই জন লোক উপস্থিত থাকবে। সেন্ট গ্রেগরী একজন পাদ্রীর প্রশংসা করে লিখছেন যে, সে ৪০ বছর পর্যন্ত তার স্ত্রী থেকে দূরে ছিল এবং মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী যখন তার কাছে যায় তখন সে বলে ঃ "নারী, তুই দূর হ।"

চার ঃ এ বৈরাগ্যবাদের সব চাইতে বেদনাদায়ক দিক ছিল এই যে, তা মা–বাপ, ভাইবোন ও সন্তানদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য মা বাবার স্নেহ–ভালবাসা, ভাইয়ের জন্য ভাই–বোনের স্নেহ–ভালবাসা এবং বাপের জন্য ছেলেমেয়ের ভালবাসাও ছিল একটি পাপ। তাদের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এসব সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের জীবন কথায় এর এমন সব হৃদয় বিদারক কাহিনী দেখা যায় যা পাঠ করে কোন মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন সন্ন্যাসী ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) বছরের পর বছর মরুভূমিতে গিয়ে সাধনা করছিল। তার বাবা মা বহু বছর ধরে তার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। একদিন হঠাৎ তার কাছে তার মা বাবার পত্র পৌছলো। এ পত্র পাঠ করে তার মনে মানবিক ভালবাসার আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে এ আশংকা দেখা দিল। তাই সে ঐ পত্রগুলো না খুলেই আগুনে নিক্ষেপ করলো। সেন্ট থিউডোরাসের মা ও বোন বহুসংখ্যক পাদ্রীর সুপারিশ পত্র নিয়ে যে খানকায় সে অবস্থান করতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং পুত্র ও ভাইকে এক নজর দেখার আকাংখা প্রকাশ করলো। কিন্তু সে তাদের সম্মুখে আসতে পর্যন্ত অস্বীকার করলো। সেন্ট মার্কাসের (St. Marcus) মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় যায় এবং খানকার প্রধানকে অনুনয়–বিনয় করে ছেলেকে মায়ের সামনে আসার নির্দেশ দিতে রাজি করায়। কিন্তু ছেলে কোনক্রমেই মায়ের

সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সে খানকা প্রধানের নির্দেশ পালন করে এভাবে যে, বেশভূষা পরিবর্তন করে মায়ের সামনে যায় এবং চোখ বন্ধ করে থাকে। এভাবে মাও ছেলেকে চিনতে পারেনি, ছেলেও মায়ের চেহারা দেখতে পায়নি। আরো একজন অলী সেন্ট পোমেন (St. Poemen) ও তার ৬ ভাই মিসরের একটি মরু খানকায় থাকতো। বহু বছর পর তাদের বৃদ্ধা মা তা খোঁজ পায় এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হয়। ছেলে দূর থেকে মাকে দেখা মাত্রই দৌড়িয়ে গিয়ে তার হুজরায় প্রবেশ করে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। মা বাইরে বসে কাঁদতে থাকলো এবং চিৎকার করে বললো ঃ এই বৃদ্ধাবস্থায় এত দীর্ঘ পথ হেটে আমি কেবল তোমাকে দেখতে এসেছি। আমি যদি তোমার চেহারা দেখি তাহলে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমার মা নই? কিন্তু সেসব অলী–দরবেশরা দরজা খুললো না। তারা মাকে বলে দিল যে, আমরা আল্লাহর কাছে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইটসের (St. Simeon Stylites) কাহিনী এর চেয়েও বেদনাদায়ক। সে তার মাকে ছেড়ে ২৭ বছর নিরুদ্দেশ থাকে। বাপ তার বিচ্ছেদে মারা যায়। মা জীবিত থাকে। ছেলের আল্লাহর অলী হওয়ার কথা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন মা ছেলের অবস্থান জানতে পারে। বেচারী মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কোন নারীর জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ছেলে হয় তাকে ভেতরে ডেকে নিক কিংবা বাইরে এসে তাকে দর্শন দিক এ ব্যাপারে মা অশেষ কাকুতি–মিনতি জানায়। কিন্তু সেই অলী তা করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানায়। এ অবস্থায় হতভাগিনী মা তিনদিন তিন রাত খানকার দরজার সামনে পড়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তখন অলী সাহেব বেরিয়ে এসে মায়ের লাশের পাশে অশ্রুপাত এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করে।

এসব অলীরা তাদের বোন ও সন্তানদের সাথেও এ ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। এক ব্যক্তি মিউটিয়াসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সে ছিল একজন সুখী–স্বচ্ছল মানুষ। হঠাৎ তাকে ধর্মীয় আবেগে পেয়ে বসে এবং সে তার ৮ বছর বয়সের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে এক খানকায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মন থেকে পুত্রের প্রতি স্নেহ–ভালবাসা দূর করা একান্ত আবশ্যক ছিল। সেজন্য প্রথমে তাকে পুত্রের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অতপর তার চোখের সামনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সে নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে নানাভাবে নির্মম কষ্ট দেয়া হতে থাকে এবং সে তা দেখতে থাকে। এরপর খানকার পুরোহিত তাকে তার ঐ সন্তানকে নিজ হাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়। সে যখন এ নির্দেশও পালন করতে প্রস্তুত হয় এবং শিশুটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয় ঠিক সে মুহূর্তে সন্ন্যাসীরা এসে তার জীবন রক্ষা করে। এরপরে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, সত্যিই সে অলী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে।

এসব ব্যাপারে খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে, আল্লাহর ভালবাসা যে ব্যক্তি চায় তাকে মানবীয় ভালবাসার সেসব শৃঙ্খল কেটে ফেলতে হবে যা পৃথিবীতে তাকে তার মা বাবা, ভাইবোন এবং সন্তান–সন্ততির সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেন্ট জিরুম বলেন ঃ "তোমার ভাতিজা যদি তোমার গলায় বাহু জড়িয়েও থাকে, তোমার মা যদি তোমাকে দুধের দোহাই দিয়ে বিরত রাখতে চায়, তোমাকে বিরত রাখার জন্য

তোমার বাবা যদি তোমার সামনে লুটিয়ে পড়ে, তারপরও তুমি সবাইকে পরিত্যাগ করে এবং বাবার দেহকে পদদলিত করে এক ফোটাও অশ্রুপাত না করে ক্রুশের ঝাণ্ডার দিকে ছুটে যাও। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাই তাকওয়া।" সেন্ট গ্রেগরী লিখেছেন ঃ "এক যুবক সন্ন্যাসী মন থেকে মা বাবার প্রতি ভালবাসা দূর করতে পারেনি। সে এক রাতে চুপে চুপে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যায়। আল্লাহ তাকে এ অপরাধের সাজা দেন। সে খানকায় ফিরে আসা মাত্রই মারা যায়। তার লাশ দাফন করা হলে মাটি তা গ্রহণ করে না। কবরে বার বার তার লাশ রাখা হয় কিন্তু মাটি তা বাইরে নিক্ষেপ করে। অবশেষে সেন্ট বেনেডিক্ট তার বুকের ওপর তাবাররুক রাখলে কবর তাকে গ্রহণ করে।" এক সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে লিখেছেন যে, সে মারা যাওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত আযাব হতে থাকে। কারণ সে মন থেকে তাঁর মায়ের ভালবাসা দূর করতে পারেনি। একজন অলীর প্রশংসায় লিখেছেন যে, নিজের আত্মীয়–স্বজন ছাড়া সে কখনো অন্য কারো সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেনি।

পাঁচ ঃ নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা প্রদর্শনের যে অনুশীলন তারা করতো তাতে তাদের মানবিক আবেগ–অনুভূতি মরে যেতো। এর স্বাভাবিক ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিরোধ দেখা দিতো এরা তাদের ওপর জুলুম–অত্যাচারের চরম পন্থা গ্রহণ করতো। চতুর্থ শতাব্দীর আগমন পর্যন্ত খৃষ্টবাদের মধ্যে ৮০–৯০টি ফিরকা সৃষ্টি হয়েছিল। সেন্ট অগাষ্টাইন তার সময়ে ৮৮টি ফিরকা গণনা করেছেন। এসব ফিরকা পরস্পরের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করতো। হিংসা বিদ্বেষের এ আগুনের ইন্ধন যোগানদাতাও ছিল সন্ন্যাসীরা। এ আগুনে বিরোধী ফিরকাসমূহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টায়ও এসব খানকাবাসী সন্ন্যাসীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। এ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের একটি বড় আখড়া ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। সেখানে প্রথমে এরিয়ান ফিরকার বিশপ আথানাসিউসের দলের ওপর হামলা করে। তার খানকা থেকে কুমারী সন্ন্যাসীনীদের ধরে ধরে বের করে আনা হয়। তাদেরকে উলংগ করে কাঁটাযুক্ত ডাল পালা দিয়ে প্রহার করা হয় এবং শরীরে দাগ লাগানো হয় যাতে তারা নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস বর্জন করে তাওবা করে। এর পর মিসরে ক্যাথলিক গোষ্ঠী বিজয় লাভ করলে এরিয়ান ফিরকার সাথে একই আচরণ করে। এমনকি খুব সম্ভবত খোদ এরিয়াস (Arius)কেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়াতেই সেন্ট সাইরিল (Cyril) এর মুরীদ সন্ন্যাসীরা ব্যাপক হাংগামার সৃষ্টি করে। এমনকি তারা বিরোধী ফিরকার এক সন্ন্যাসিনীকে ধরে তাদের গীর্জায় নিয়ে হত্যা করে এবং লাশ টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে নিক্ষেপ করে। রোমের পরিস্থিতিও এর থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে পোপ লিবেরিয়াস (Liberius) এর মৃত্যু হলে দুই গোষ্ঠীই পোপের পদের জন্য নিজ নিজ প্রার্থী দাঁড় করায়। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক খুনাখুনি ও রক্তপাত হয়। এমনকি একটি চার্চ থেকে একদিনে ১৩৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ছয় ঃ দুনিয়া বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপন এবং কৃচ্ছ্রতা ও দরবেশীর জীবন যাপনের পাশাপাশি পার্থিব ধন–সম্পদ উপার্জনও কম করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই পরিস্থিতি এ দাঁড়িয়েছিল যে, রোমের বিশপ তার মহলে রাজা–বাদশাহদের মত বসবাস করতো। আর সে যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে শহরে বের হতো তখন তার জাঁকজমক

কাইজারের চাইতে কম হতো না। সেন্ট জিরুম তার সময়ে (চতুর্থ শতাব্দীর শেষযুগ) অভিযোগ করেছেন যে, বহু সংখ্যক বিশপের খাওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ জাঁকজমকের দিক দিয়ে গভর্ণরদের খাওয়া অনুষ্ঠানসমূহকে লজ্জা দিত। খানকাহ ও গীর্জাসমূহের প্রতি সম্পদের এই প্রবাহ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল (কুরআন নাযিল হওয়ার যুগ) পর্যন্ত প্লাবনের আকার ধারণ করেছিলো। জনসাধারণের মনে একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিলো যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন বড় গোনাহর কাজ সংঘটিত হলে কোন না কোন অলীর দরগায় নজরানা পেশ করে কিংবা কোন খানকাহ বা চার্চকে ভেট ও উপঢৌকন দিয়েই কেবল ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। যে পার্থিব স্বার্থ ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করাই ছিল পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের বিশেষ বৈশিষ্ট তা–ই এখন তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়লো। যে জিনিস বিশেষ ভাবে এ অধপতনের কারণ হয় তা ছিল সন্ন্যাসীদের অস্বাভাবিক আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রবৃত্তি দমনের চরম প্রচেষ্টা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চরম ভক্তি–শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে বহু দুনিয়াদার লোক দরবেশের পোশাক পরে পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের দলে অন্তরভুক্ত হয়েছিলো। তারা পার্থিব স্বার্থ বর্জনের মুখোশ পরে দুনিয়া অর্জনের কারবার এমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল যে, বড় বড় দুনিয়াদারও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

সাত ঃ সতীত্বের ক্ষেত্রেও বৈরাগ্যবাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বারবার পরাজয় বরণ করেছে আর সে পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। খানকাসমূহে প্রবৃত্তি দমনের এমন কিছু অনুশীলনও ছিল, যে ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মিলে একই জায়গায় থাকতো এবং কোন কোন সময় কিছুটা কঠিন অনুশীলনের জন্য একই বিছানায় রাত কাটাতো। বিখ্যাত দরবেশ সেন্ট ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) অত্যন্ত প্রশংসামুখর হয়ে ফিলিস্তিনের কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী–দরবেশের আত্ম সংযমের উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তারা তাদের আবেগ অনুভূতিকে এতটা কাবু করতে সক্ষম হয়েছিল যে, নারীদের সাথে এক জায়গায় গোসল করতো কিন্তু তাদেরকে দেখে, তাদের স্পর্শ পেয়ে এমনকি তাদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও তাদের প্রবৃত্তি সাড়া দিতো না।" বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিতে গোসল যদিও অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের গোসলও করা হতো। শেষ পর্যন্ত এ ফিলিস্তিন সম্পর্কেই নাইসার (Nyssa) সেন্ট গ্রেগরী যিনি ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন—লিখেছেন যে, ফিলিস্তিন অসৎ ও দুশ্চরিত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যারা মানব–প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানব–প্রকৃতি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষান্ত হয় না। বৈরাগ্যবাদ এর বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে লাম্পট্যের যে গহ্বরে পতিত হয়েছে তার কাহিনী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি কুৎসিত কলঙ্ক। দশম শতাব্দীর একজন ইতালীয় বিশপ লিখছেন ঃ চার্চে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে যদি লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতার শাস্তিমূলক আইন কার্যকর করা হয় তাহলে চার্চের কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে কেবল বালকরা ছাড়া আর কেউ তা থেকে রক্ষা পাবে না। আর যদি অবৈধ সন্তানদেরকেও ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার নিয়ম চালু করা হয় তাহলে হয়তো চার্চের কাজে নিয়োজিত কোন বালকই সেখানে থাকতে পারবে না। মধ্য যুগের লেখকদের গ্রন্থসমূহ এ ধরনের অভিযোগ ও কাহিনীতে ভরা যে, সন্ন্যাসিনীদের খানকাসমূহ চরিত্রহীনতার আখড়া তথা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, চতুর্দেয়ালের মধ্যে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ওপর ঈমান আনো।[৫৫] তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে[৫৬] এবং তোমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন।[৫৭] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (তোমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিত)যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান তা দেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

নবজাতক শিশুদের গণহত্যা চলছে, পাদ্রী এবং চার্চের ধর্মীয় কাজ সম্পাদনকারী কর্মীদের মধ্যে "মুহরেম" বা যেসব নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাদের সাথে পর্যন্ত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ও খানকাসমূহে সমকামিতার অপরাধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং গীর্জাসমূহে পাপ স্বীকারের (Confession) অনুষ্ঠান দুষ্কর্ম ও চরিত্রহীনতার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে বৈরাগ্যবাদরূপী বিদআত আবিষ্কার করা এবং পরে তা যথার্থভাবে মেনে চলতে না পারার কথা বলে খৃষ্টান ধর্মের কোন্ বিকৃতির প্রতি ইংগিত করছে বিস্তারিত এসব বর্ণনা থেকে তা সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে।

৫৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মুফাসসির বলেনঃ এখানে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কথাটি দ্বারা যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনো। এজন্য তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। একটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনার জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার জন্য। অপর দল বলেন, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা শুধু মৌখিকভাবে তার নবুওয়াতকে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়ো না, বরং সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমান গ্রহণের হক

আদায় করো। এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহ ইসলামের খেদমত করার ও তার ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য। সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৪ পর্যন্ত আয়াত প্রথম তাফসীরের সমর্থন করে। তাছাড়া হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছে

رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো এবং পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওপর ঈমান এনেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সূরা সাবার ৩৭ আয়াত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থন করে যাতে বলা হয়েছে; সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। দলীল–প্রমাণের দিক দিয়ে দু'টি তাফসীরই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে দ্বিতীয় তাফসীরটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সূরার বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ তাফসীরকেই সমর্থন করে। যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এ সূরার শুরু থেকে সেসব লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে। গোটা সূরায় তাদেরকেই সম্বোধন করে এ আহবান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দান করে ঈমানদার না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করে।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ–সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার উল্লেখ ১২ আয়াতে পূর্বেই করা হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈমানের দাবী পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার কারণে তোমাদের দ্বারা যে ভুল ত্রুটিই সংঘটিত হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় তোমাদের দ্বারা যেসব ভুল–ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তাও ক্ষমা করে দেবেন।